পথের টানে

একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণকথা

গৌতম কুমার মণ্ডল

শ্রীলঙ্কার পণ্ডিত অনাগারিক ধর্মপাল (১৮৬৪-১৯৩৩) স্বামী বিবেকানন্দের এক সময়ের বন্ধু ছিলেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে হীনযানী বৌদ্ধ প্রতিনিধি হয়ে তিনি আমেরিকা যান। ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মের কট্টর প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন তিনি। একবার বুদ্ধগয়ায় গিয়ে ধর্মপাল দেখলেন বুদ্ধমন্দির সহ সমস্ত স্থানটি এক শৈব মহন্তের দখলে। বুদ্ধগয়া মন্দিরের উপর বৌদ্ধ নিয়ন্ত্রণ আদায়ের লড়াই শুরু হল তাঁর। সরকারের বিভিন্ন বিভাগে অভিযোগ জানানো, পত্রপত্রিকায় লেখালেখি থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হলেন তিনি। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে হার হয়েছিল তাঁর। কিন্তু তিনি থেমে যাননি। বলতে গেলে আজীবন এই লড়াই তিনি চালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর বহু পরে, ১৯৪৯ সালে মহাবোধি সোসাইটি বুদ্ধগয়া মন্দির সংস্কারের দায়িত্ব পায়। ইংরেজ সরকার বিশেষত লর্ড কার্জন ধর্মপালের পক্ষেই ছিলেন। আইনি লড়াইয়ে হেরে গিয়ে ধর্মপাল বাংলার শিক্ষিত শ্রেণির সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তথা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সমর্থন সম্ভবত ধর্মপালের দিকেই ছিল। কিন্তু বাংলার জমিদারদের প্রভাবশালী সংগঠন 'The British Indian Association'-এর সমর্থন তিনি পাননি। এই দ্বৈরথের পটভূমিকায় ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধগয়ায় গিয়ে বিষয়টি সরেজমিনে বোঝার জন্য বাংলার বিশিষ্ট মানুষদের নিয়ে তিনি কয়েকদিনের বুদ্ধগয়া ভ্রমণের আয়োজন করলেন। এই ঐতিহাসিক ভ্রমণের সময়কাল ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের ৮-১২ তারিখ।

এর আগে অন্তত দুবার নিবেদিতা সেখানে গিয়েছেন। স্বামীজীর কাছে ভগবান বুদ্ধের কথা শুনে তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধ-অনুরাগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাছাড়া ভারতকে তিনি জেনেছিলেন অক্লান্ত ভ্রমণের মাধ্যমেও। তাই বৌদ্ধধর্ম এবং বুদ্ধগয়া নিবেদিতার চেতনায় একটি বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল। এ-সম্পর্কে বহু পড়াশোনার ফলে এবং স্বামীজীর প্রভাবে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, ''বৌদ্ধধর্ম কোনও নতুন ধর্ম নয়'',

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ আশ্রম মহাবিদ্যালয়, সুইসা, পুরুলিয়া

''হিন্দুত্বের এক অপরিহার্য অংশ হল বৌদ্ধধর্ম'', ''হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম পাশাপাশি বিরাজ করত সৌহার্দিক পরিবেশে এবং বৌদ্ধধর্ম স্বাভাবিক নিয়মে সময়ের সঙ্গে ক্ষয়ে যায়।''[১] তাঁর 'Footfalls of Indian History' গ্রন্থেও এই ভাবনার প্রকাশ।

এই মত অনাগারিক ধর্মপালের চিন্তাভাবনার বিপরীত ছিল। ধর্মপালের দাবি এবং তাঁর ভাবনা যে সঠিক নয় তা বাংলার কৃতবিদ্য মানুষদের দেখানোর জন্যই নিবেদিতার এই বুদ্ধগয়া ভ্রমণের পরিকল্পনা। ২১ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ মিস ম্যাকলাউডকে চিঠিতে লিখেছেন, ''I am trying to arrange a party for Bodh-Gaya, Oct 8th to fourteen, I shall be so thankful if the leaders of public opinion can be brought into personal contact with the Mohunt.'' বিশিষ্টজনেদের জোট বেঁধে নিয়ে যাওয়া কম উদ্যোগের বিষয় নয়, তবু নিবেদিতা সেই ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন।

যে-দলটি নিবেদিতার আগ্রহে বুদ্ধগয়া গেলেন তাদের মধ্যমণি ছিলেন অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। কবি তখন বাংলার একজন বিশিষ্ট মানুষ। ইতিমধ্যে কবি হিসেবে যেমন তিনি সুনাম অর্জন করেছেন, তেমনি তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কৃতী পুরুষ, সম্ভ্রান্ত জমিদার। ধর্মপাল কলকাতায় এসে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে সমস্ত বিষয়টি নিজের মতো করে বলেছিলেন। হয়তো সেকারণেও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়া জরুরি ছিল। কবিও যাওয়ার জন্য উৎসাহী হন। বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখছেন, ''জগদীশ, নিবেদিতা, জগদীশজায়া, সিস্টার ক্রিষ্টিন, লালু, যতী, সম্ভবতঃ আমি [মহর্ষির শরীর খারাপের জন্য কবির যাওয়া প্রথমদিকে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল], তুমি, সন্তোষ ও রথী। সর্ব্বসমেত ৯।১০।''[২] বন্ধুকে ভ্রমণসূচি জানিয়ে কবি লিখেছেন, ''Howrah Kalka Through Passenger নামক যে গাড়িখানা সাড়ে চারটার সময় কলকাতা ছাড়ে ও রাত দেড়টার সময় মধুপুর পৌঁছয়—এবং কৌলে [কিউল] প্রাতঃকালে ছাড়িয়া গয়ায় পৌঁছয় মধ্যাহ্নে—সেই ট্রেনযোগে আমরা ছাড়চি। একটা পুরা গাড়ি রিজার্ভ করার কথা, সুতরাং কিউলে বদল করতে হবে না।''[৩]

যাওয়ার আগে এ নিয়ে আলোচনার জন্য রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্রের বাড়ি গিয়েছেন। ৬ অক্টোবর গগনেন্দ্রনাথের বাড়িতে এই যাত্রিদলের প্রধানেরা এক চা-চক্রে মিলিত হন। তবে শ্রীশচন্দ্রকে কবি যে-তালিকা দিয়েছিলেন দল তার চেয়েও বড় হয়েছিল। দলে ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর (লালুকর্তা) ও তাঁর শিক্ষক মোক্ষদাকুমার বসু, আনন্দমোহন বসুর দুই কন্যা—সম্পর্কে যাঁরা ছিলেন জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয়ী, আর সন্তোষ মজুমদার (শ্রীশচন্দ্রের বড় ছেলে, কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের সহপাঠী)। পাটনা থেকে এই দলে যোগ দিয়েছিলেন ঐতিহাসিক ও পাটনা কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক যদুনাথ সরকার। নিবেদিতা শুধু পণ্ডিতদের নয়, কমবয়সি ছেলেদের নিয়েও ভারতের তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণের পক্ষপাতী ছিলেন। এর আগে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ, বেলুড় মঠের স্বামী সদানন্দ, অমূল্য মহারাজ (পরে যিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী শংকরানন্দ) সহ পনেরো-ষোলো জন অল্পবয়স্ক ছেলের একটি দল নিয়ে নিবেদিতা হিমালয়ে ঘুরে এসেছেন। দলবদ্ধ ভ্রমণে তাঁর আনন্দ আর দক্ষতার অভাব নেই।

মিস ম্যাকলাউডকে রাজগির থেকে ১৫ অক্টোবর ১৯০৪-এর পত্রে নিবেদিতা লিখেছেন : ''ভাবো তো তোমার চিঠি আমার কাছে কোথায় পৌঁছোল? বুদ্ধগয়ায়!... আমরা ২০ জনের দল—বুদ্ধগয়ায় ৪ দিন কাটাচ্ছি গেস্ট হাউসে—মনে হয় এটা আমাদের জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা।...

সকাল ছটার মধ্যে চা পান করে বই পড়তাম—লাইট অফ এশিয়া, ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ ইত্যাদি আর কথাবার্তা হত। সবাই মিলে বারান্দায় জড়ো হতাম। আমাদের মহন্ত ঠিক রাজার মতো। বিকেলে চা পান করে বেরোতাম—মন্দিরে, বোধিবৃক্ষতলে—সুজাতার বাড়ি বা এমনিই কোথাও।"[৪]

নিবেদিতা যে-চারদিনের কথা বলেছেন সেই চারদিন হল অক্টোবর মাসের নয় থেকে বারো তারিখ। তাঁরা আট তারিখ বিকেলে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে নয় তারিখ দুপুরে বুদ্ধগয়ায় পৌঁছন। এই চারদিন নিবেদিতাই যেন ছিলেন ট্যুরিস্ট গাইড। সবকিছু পরিকল্পনা তিনিই করতেন। আগের ভাবনামতো তাঁরা তাঁবুতে থাকেননি, ছিলেন গেস্ট হাউসে। নিবেদিতার মৃত্যুর পরে আচার্য যদুনাথ সরকার এই ভ্রমণের স্মৃতিচারণ করেছিলেন 'Sister Nivedita as I knew her' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে : ''There were daily readings from Warren's Buddhism in Translations and occasionally Edwin Arnold's Light of Asia; some songs and recitations by the poet, too. In the daytime we strolled through the temple enclosure, or visited the neighbouring villages. In the evening twilight we went to the Bodhi tree and sat in the gloom in silent meditation. There we found a remarkable character Fuji, a poor Japanese fisherman had by hard austerity for many years."[৫]

এই বুদ্ধগয়া ভ্রমণের কথা লিখে রেখেছেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর ডায়েরিতে এবং তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে। তিনিও স্মরণ করেছেন দরিদ্র জাপানি ভক্ত ফুজিকে। প্রতিদিন একটি সাদা থান গায়ে দিয়ে ভগবান বুদ্ধের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে শান্ত সমাহিত চিত্তে তিনি পালিতে মন্ত্র উচ্চারণ করতেন। জাপানি ভক্তের এই আত্মনিবেদন রবীন্দ্রনাথ সহ অনেকের মনেই গভীর প্রভাব ফেলেছিল। 'পিতৃস্মৃতি'-তে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''আমরা বুদ্ধগয়ায় মোহন্তের অতিথি হব ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁর অতিথিশালায় বিরাট বাড়ির তেতলার ঘরগুলিতে থাকতে দিয়েছিলেন, কিন্তু ঘরের বিশেষ প্রয়োজন হয়নি, সামনে যে প্রকাণ্ড বারান্দা ছিল তাতেই সুখে স্বচ্ছন্দে আসর জমিয়েছিলুম। আতিথ্যের অভাব হয়নি, উত্তম দুধ ঘি ফলমূল বহুবিধ খাদ্য সব সময়ই প্রস্তুত। রোদ পড়ে গেলে সন্ধ্যের দিকে সকলে মিলে মন্দির দেখতে যাই। ত্রিপুরার মহিম ঠাকুর ও লালুকর্তা দুজনেরই ফটো তোলার শখ; তাঁদের সঙ্গে ছোট বড় নানা রকম ক্যামেরা ছিল; দিনের আলো থাকতে কোনও সময় গিয়ে তাঁরা বহু ফোটো তুলে রেখেছিলেন। মন্দির দেখা হলে আমরা মন্দিরের পিছনের দিকে বোধিদ্রুমের নিকটে গিয়ে বসলুম। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, মন্দিরের গায়ে গবাক্ষগুলিতে প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। চার দিক নিস্তব্ধ; তার মধ্যে কানে এল 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'—বৌদ্ধমন্ত্রের মৃদু গম্ভীর ধ্বনির আবর্তন।"[৬]

বৌদ্ধদের শান্ত সংযত অনাড়ম্বর উপাসনা তাঁদের ভাল লেগেছিল। অনতিপরেই পুরোহিতদের ঢাক ঢোল বাজিয়ে সন্ধ্যারতি কবিপুত্রের কাছে মনে হয়েছিল 'কর্কশ'। এই শান্ত পরিবেশে জাপানি ভক্তদের আত্মনিবেদনের নম্রতা ও ভক্তি তাঁদের বেশি আকর্ষণ করেছিল। রথীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন, ''অনেক রাত পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা ও পিতৃদেব বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ ইতিহাস নিয়ে নিবিষ্ট মনে আলোচনা করতেন। নিবেদিতা এক একটি তর্ক তোলেন আর রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেন তার যথাযোগ্য সমাধানে পৌঁছতে। আমরা অন্যেরা তাঁদের প্রশ্নোত্তর তর্ক-বিতর্ক মুগ্ধ হয়ে শুনে যাই।"[৭]

এইসব আলোচনার কোনও বিবরণী নেই। এমনকী যেসব ফোটো তোলা হয়েছিল সেগুলিও পাওয়া যায় না। এ নিয়ে আক্ষেপ করেছেন অনেকেই। বিবরণী থাকলে আমরা জানতে পারতাম অনাগারিক ধর্মপাল সে সময় যে-বিতর্ক ও হইচই বাধিয়ে তুলেছিলেন সে সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র, কবি বা যদুনাথের মতামত কী ছিল। তবে অনেকেই অনুমান করেছেন যে এ-বিষয়ে কবির মত ধর্মপালের অনুকূলেই ছিল—নিবেদিতা চাইলেও কবি মহন্তের পক্ষ নিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। এই ভ্রমণ সম্পর্কে কবি তাঁর বন্ধু তথা দার্শনিক মোহিতচন্দ্র সেনকে গিরিডি থেকে লিখেছেন, ''বুদ্ধগয়াতে থাকবার সময় যদিও অনেক অনিয়ম সহ্য করতে হয়েছিল তবু সেখানকার বৌদ্ধমন্দির দেখে একথা মনে হয়েছে যে না দেখলে জীবন অসম্পূর্ণ থাকত।''[৮] এই ভ্রমণ কবির রচনায় যে-সদর্থক প্রেরণা নিয়ে এসেছিল তা আমরা জানি। ভগবান বুদ্ধের মহিমা, তাঁর প্রশান্ত রূপ, বহুজনহিতায় যাপিত জীবন, বৌদ্ধদের অহিংস ভাবনা তাঁর মনে গভীরতর ছাপ ফেলেছিল। 'নটীর পূজা', 'চণ্ডালিকা', 'অভিসার', 'পূজারিণী', 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' 'দীনদান', 'নগরলক্ষ্মী', 'মূল্যপ্রাপ্তি' প্রভৃতি নাটকে কবিতায় তা প্রকাশিত হয়েছে।

১৯১১-র নভেম্বরে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় এই ভ্রমণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে লেখা হয়, ''[নিবেদিতা] মন্দিরের পাদদেশে বন্ধুদের সান্নিধ্যে নীরবে বসে থাকতেন দীর্ঘক্ষণ। শরতের আকাশে তারা ঝিকমিক করত, লণ্ঠনগুলির শিখা কমিয়ে সরিয়ে রাখা হত ঝোপের আড়ালে। মনে হত তিনি যেন প্রবেশ করছেন সুদূর অতীতে। কিছুক্ষণ পরে বলতে শুরু করতেন বৌদ্ধযুগের কথা, নির্ভুল ঐতিহাসিক তথ্য সহকারে।''[৯]

সম্ভবত কবির মন মহন্তের অনুকূলে আসেনি। সেই আক্ষেপ নিবেদিতার ছিল। সেকথাই কি আছে উক্ত বিবরণীতে? ''বুদ্ধগয়া থেকে চলে আসার আগে তিনি ভেঙে পড়লেন। নিজের ঘরে কেঁদে চললেন সারারাত। বলতে থাকলেন, 'আমরা হেরে গেলাম। এই দেশের ঘুম এখনও ভাঙাতে পারলাম না, একে জীবনে ফেরানো গেল না এখনও। মানুষ আমার কথা শোনে, কিন্তু তারপর ফিরে যায় তাদের প্রাচীন পন্থায়। কিছু করতে পারলাম না।' ''[১০]

ভ্রমণশেষে গয়া স্টেশনে এসে সবাই বিভিন্ন ট্রেন ধরেছিলেন। সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র ফিরলেন বোম্বে মেলে। ফার্স্ট ক্লাসের ইংরেজ যাত্রীর সঙ্গে বচসা করে নিবেদিতাই ট্রেনে তুলে দিলেন তাঁদের। নিবেদিতা নিজে অন্য ট্রেনে গেলেন রাজগির। রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুরা নিবেদিতার মালপত্র ট্রেনে তুলে দিলেন। কবি ও তাঁর সঙ্গীরা নিজেদের মতো ফিরলেন। যেদিন তাঁরা কলকাতা থেকে রওনা হন সেদিন ছিল মহালয়া। আর ফেরার সময় আকাশে বাতাসে পুজোর বাজনা। ✠

তথ্যসূত্র

১। দ্রঃ ভগিনী নিবেদিতা, *প্রসঙ্গ বৌদ্ধধর্ম*, সম্পাদনা ও টীকা : প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, সৌম্যেন পাল, অনুবাদ : স্বাতী ঘোষ, সিগনেট প্রেস, ২০১৫ [এরপর, *প্রসঙ্গ বৌদ্ধধর্ম*]

২। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪১৮, খণ্ড ৫, পৃঃ ২০৫ [এরপর, *রবিজীবনী*]

৩। তদেব

৪। *প্রসঙ্গ বৌদ্ধধর্ম*, পৃঃ ১৫০-৫১

৫। *রবিজীবনী*, পৃঃ ২০৬

৬। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পিতৃস্মৃতি*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৩৬৭, পৃঃ ২৫৩

৭। তদেব, পৃঃ ২৫৪

৮। *রবিজীবনী*, পৃঃ ২০৮

৯। *প্রসঙ্গ বৌদ্ধধর্ম*, পৃঃ ১৩৭

১০। তদেব, পৃঃ ১৩৮-৩৯